OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 255 - 264
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কালিন্দী' উপন্যাসে প্রতিফলিত আদিবাসী সমাজ-সংস্কৃতি ও সংগ্রাম

শ্যাম সুন্দর হাঁসদা
স্বেচ্ছাধীন গবেষক
Email ID : hansdashyamsundar32@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জীবন দর্শন, রচনা বৈশিষ্ট্য, কালিন্দী উপন্যাস, আদিবাসী সমাজ, আদিবাসী সংস্কৃতি, আদিবাসী জনজাতি।

Abstract
Tarashankar was born on July 24, 1898. Growing up in the Lavpur area of Birbhum district, he developed a close connection with rural nature. Being the son of a landlord family, the landlord system is mentioned in his novels and stories. At one time, people of the Rajbangshi, Jele, Het, Bhalla, Sadgop, Kora, Kahar, Bhuimali, Mochi, Methar, Chamar, and Santal tribes lived in Birbhum along with the Hari, Dom, Bagdi, and Bauri communities.

He closely observed the various reforms in village life, the various folk activities of the society, the diversity of the language of the rural people, the conflict between the declining landlord system and the newly created merchant system. The social, political and economic conditions of the rural villages during this period are highlighted in his stories and novels.
Tarashankar's novels can be divided into three periods.

Early period 1930-38
Middle period 1939-1947
Final period 1948-1971.

The novels of the first period are "Chaitali Vyurvi", Nilkanth, Pashan Puri, Raikamal, Agun. The novels written in the middle period are Dhatridevata, Kalindi, Tinshunya, Ganadevata, Manvantar, Panchagram, Kabi, Sandipan Pathshala, Abhiyan. The novels written in the last period are - Hasuli Baker Upakatha, Nagini Kanyar Kahini, Arogya Niketan, Chapa Dangaar Bau, Kalantar, Saptapadi, Aranyabahni, Ganna Begum, Radha.

Our topic of discussion: Indigenous society, culture, and struggle as reflected in the novel Kalindi. In our discussion, we have tried to analyze and highlight the life of indigenous people during that time as depicted in the novel.

Discussion

বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের পরবর্তী সময়ে বাংলা সাহিত্যে ত্রয়ী বন্দোপাধ্যায় নিয়ে এলেন এক ভিন্ন ধারার সাহিত্য, যার মধ্যে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। কথাসাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ হলেও উপন্যাসের সৃষ্টিতে তিনি অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। তাঁর রচিত বিভিন্ন পর্বের বিভিন্ন উপন্যাস বিভিন্নভাবে বাংলা সাহিত্যে বৈচিত্র এনে দিয়েছে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রত্যেকটি উপন্যাসে তাঁর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি তৎকালীন সমাজের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে প্রকাশিত হয়েছে। রাঢ়ের মানুষ, ভাষা, সমাজচিত্র অন্ত্যেজ মানুষের বিচিত্র জীবন প্রবাহ, তাদের বিচিত্র পেশা, খাদ্য সংগ্রহের সংগ্রাম, তাদের ওপর জমিদার, ভূস্বামীদের অত্যাচার প্রথম দিকের উপন্যাসগুলিতে প্রাধান্য পেয়েছে। বীরভূমের লাভপুরে জমিদার পরিবারে জন্ম huawei জমিদারি জীবনকে তিনি খুব কাছ থেকে দেখেছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রকে বলতে শুনি—'মাটি বাপের নয়, দাপের, দাপ তো আয়ে নাই, দাপ আছে বুকে।' ১৩৩৮ সালে 'চৈতালি ঘূর্ণি' উপন্যাস—তারাশঙ্করের প্রথম উপন্যাস হিসেবে প্রকাশিত হয়, বইখানি উৎসর্গ করেন সুভাষচন্দ্র বসুকে।

লাভপুর অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষাকে সাহিত্যে ব্যবহার করতে গিয়ে প্রথম দিকে পাঠক বুঝতে পারবেন কিনা সে নিয়ে তাঁর একটা আশঙ্কা ছিল। পরবর্তীকালে সে আশঙ্কা দূর করে রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন করেন, ফলে নির্দ্বিধায়, অসঙ্কোচে তিনি অন্ত্যজ মানুষের আঞ্চলিক ভাষাকে সাহিত্যে তুলে আনেন। প্রথম দুটি পর্বের উপন্যাসগুলিতে আঞ্চলিক ভাষার বৈচিত্র্য ফুটে উঠেছে, তবে শেষ পর্ব বা আধুনিক পর্বের উপন্যাসগুলি প্রায় সবই নগরকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে।
তারাশঙ্কর রচিত উপন্যাসগুলিকে আমরা তিনটি ভাগে ভাগ করতে পারি—

আদি পর্ব : ১৯৩০—১৯৩৮
মধ্য পর্ব : ১৯৩৯—১৯৪৭
অন্ত্য পর্ব : ১৯৪৮—১৯৭১ (স্বাধীনতা উত্তর)

আদিপর্বের উপন্যাস : 'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৩৩৬), 'নীলকণ্ঠ' (১৩৩৮), 'পাষাণ পুরী' (১৩৪০), 'রাইকমল' (১৩৪১), 'আগুন' (১৩৪৩)।

মধ্যপর্বের উপন্যাস : 'ধাত্রীদেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' ১৯৪০), 'তিনশূন্য' (১৯৪১), 'গণদেবতা' (১৯৪২), 'মন্বন্তর' (১৯৪৪), 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪), 'কবি' (১৯৪২), 'সন্দীপন পাঠশালা' (১৯৪৬), 'অভিযান' (১৯৪৭)।

অন্ত্যপর্বের উপন্যাস : 'পদচিহ্ন' (১৯৫০), 'উত্তরায়ণ' (১৯৫০), 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' (১৯৫১), 'তামস তপস্যা' (১৯৫২), 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' (১৯৫২), 'আরো্েগ্য নিকেতন' (১৯৫৩), 'চাঁপাডাঙার বৌ' (১৯৫৪), 'পঞ্চপুত্তলি' (১৯৫৬), 'বিচারক' (১৯৫৭), 'সপ্তপদী' (১৯৫৮), 'বিপাশা' (১৯৫৯), 'রাধা' (১৯৫৯), 'মানুষের মন' (১৯৫৯) ও 'ডাকহরকরা' (১৯৫৯) মহাশ্বেতা (১৯৬১), যোগভ্রষ্ট (১৯৬১), না (১৯৬১), নাগরিক (১৯৬১), নিশিপদ্ম (১৯৬২), যতিভঙ্গ (১৯৬২), কান্না (১৯৬২), কালবৈশাখী (১৯৬৩), একটি চড়ুই পাখি ও কালো মেয়ে (১৯৬৩), জঙ্গলগড় (১৯৬৪), মঞ্জরী অপেরা (১৯৬৪), সংকেত (১৯৬৪), ভুবনপুরের হাট (১৯৬৪), বসন্তরাগ (১৯৬৪), স্বর্গমর্ত্য (১৯৬৫), বিচিত্রা (১৯৬৫), গন্না বেগম (১৯৬৫), অরণ্যবহ্নি (১৯৬৬), হীরাপান্না (১৯৬৬), মহানগরী (১৯৬৬), গুরুদক্ষিণা (১৯৬৬), শুকসারি কথা (১৯৬৭), কীর্তিহাটের কড়চা (১৯৬৭), মণিবৌদি (১৯৬৯), ছায়াপথ (১৯৬৯), কালরাত্রি (১৯৬৯), রূপসী বিহঙ্গিনী (১৯৭০), অভিনেত্রী (১৯৭০), ফরিয়াদ (১৯৭১), সুতপার তপস্যা (১৯৭১), একটি কালো মেয়ের কথা (১৯৭১), নবদিগন্ত (১৯৭৩)।

'আমার কালের কথা' গ্রন্থে তারাশঙ্কর বলেছেন— 'এমনি দ্বন্দ্বের সমারোহে সমৃদ্ধ লাভপুরের মৃত্তিকায় আমি জন্মেছি। সামন্ততন্ত্র বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে ব্যবসায়ীদের দ্বন্দ্ব আমি দুচোখ ভরে দেখেছি। যে দ্বন্দ্ব ধাক্কা খেয়েছি। আমরাও ছিলাম ক্ষুদ্র জমিদার। সে দ্বন্দ্বে আমাদেরও অংশ ছিল।'

তৃতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে গ্রামীন আর্থসামাজিক অবস্থার বিপর্যয় নাগরিক সভ্যতার করাল গ্রাসে পল্লী জীবনের মানুষদের পেশা সংকট, পল্লী সংস্কৃতির ধ্বংসের স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে।

পল্লীসংস্কৃতি ও রাঢ়ের সামন্ততান্ত্রিক জীবনযাত্রাকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত উপন্যাস 'কালিন্দী' প্রকাশিত হয় ১৯৪০ সালে। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু জমিদার শ্রেণী আর অন্যদিকে ধণিক সম্প্রদায়ের সংঘাত এবং ধণিক সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করাই এই উপন্যাসের মূল আলোচ্য বিষয়।

'প্রবাসী' মাসিক পত্রিকায় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা থেকে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভদ্র পর্যন্ত 'কালিন্দী' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের ভাদ্র মাসে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

'কালিন্দী উপন্যাসে চারটি পর্যায়ে চারটি বিষয় প্রাধান্য পেয়েছে। যথা—জমিদার, চাষি, সাঁওতাল ও মিল মালিক প্রসঙ্গ। কালিন্দী নদীর চরের দখল ও খাজনা নিয়ে কাহিনীতে মূল দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। রায়হাট গ্রামের প্রান্তে যে নদীটা বয়ে চলেছে তার নাম ব্রাহ্মণী, স্থানীয়রা বলে কালিন্দী বা কালী নদী। অতীতে কালী নদীর গর্ভভূমির দিকে এখন একটি চরের জন্ম হয়েছে। গ্রামের জমিদার রায় বংশের বহুজন শরিক, মহাজন, চাষী এই চরের স্বামীত্ব লাভের জন্য বিবাদে লিপ্ত হল।

> "সমস্ত লইয়া বিবদমান পক্ষের সংখ্যা এক শত পনেরোয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরোধী। জমিদারগণের প্রত্যেকের দাবি-চর তাহার সীমানায় উঠিয়াছে, সুতরাং সেটা তাহারই খাস-দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি, তাহার নিকট আবদ্ধীয় জমির সংলগ্ন হইয়া উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহার নিকট আবদ্ধীয় সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত এবং নাকি তাহাই হইতে হইবে। প্রজা কয়েক জনের দাবি-কালীর গ্রাসে এপারে তাহাদের জমি গিয়াছে, সুতরাং ওপারে যে ক্ষতিপূরণ কালী দিয়াছে সে প্রাপ্য তাহাদের।"[১]

অনেক শরিকদের মধ্যে দুটি শক্তিশালী শরীক হল, — রায়বংশের দৌহিত্র বংশ অর্থাৎ ইন্দ্র রায়ের বংশানুক্রমিক প্রতিপক্ষ রামেশ্বর চক্রবর্তী, আর অপরপক্ষ রায়বংশের সবথেকে ধুরন্ধর ব্যক্তি কূট কৌশলীতে সিদ্ধহস্ত ইন্দ্র রায়। এই 'ইন্দ্র রায়ের হাত গরুড়ের তীক্ষ্ণ নখরের মত প্রসারিত হইলে কখনও শূন্য মুষ্টিতে ফেরে না, ভূখন্ডও বোধ করি উপড়াইয়া উঠিয়া আসে।'

রামেশ্বর চক্রবর্তী এক সময় ইন্দ্র রায়ের সমকক্ষ ছিলেন কিন্তু বর্তমানে কালের প্রভাবে আর সে গৌরব তার নেই। দৃষ্টিহীন হয়ে অন্ধকার ঘরে ভূমিশায়ী হয়ে জীর্ণ জয়স্তম্ভের মতো অবস্থান করছেন।

এই দুই বংশের মধ্যে বিরোধ যদিও আজকের নয়, তিন পুরুষ পূর্বে তার সূত্রপাত। রামেশ্বরের পিতামহ পরমেশ্বর রায় বংশের মাঝের বাড়ির সম্পত্তির উত্তরাধিকারীণী কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। শ্বশুরের মৃত্যুর পর যখন তিনি এই গ্রামে মালিক হয়ে বসলেন রায়েদের সঙ্গে তার বিবাদ বাঁধল সেই দিন থেকেই। সেদিন রায় বাড়ির মুখপাত্র ছিলেন আজকের ইন্দ্র রায়ের পিতামহ রাজচন্দ্র রায়।

পরমেশ্বর ও রাজচন্দ্রের বিরোধের চেয়ে পরিস্থিতি তৈরী হল তাতে দুই বংশের মিলনে বাধা সৃষ্টি হলেও কিছু গ্রাস করেনি। পরমেশ্বরের পুত্র সোমেশ্বরের আমলে মামলা-মোকদ্দমায় রায় ও চক্রবর্তী বংশের প্রভূত সম্পত্তি গ্রাস করে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় সোমেশ্বর সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়ে কপালে সিঁদুর ফোঁটা এঁকে সাঁওতাল বাহিনী পরিচালনা করেছিলেন। রায়বংশ নির্বংশ করতে, রায়হাট ভূমিসাৎ করতে সংকল্প নিলেন সোমেশ্বর—

> "সত্য বলিতে গেলে, সে গর্জন তাহার শূন্যগর্ভ কাংস্যপাত্রের নিনাদ নয়, তাঁহার অধীনে তখন হাজারে হাজারে সাঁওতাল উন্মত্ত শক্তি লইয়া ইঙ্গিতের অপেক্ষা করিতেছে। সোমেশ্বরের গৌরবর্ণ রূপ, পিঙ্গল চোখ, পিঙ্গল চুল দেখিয়া তাহারা তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত, বলিত, রাঙা-ঠাকুর।"[২]

সোমেশ্বরের মাতা পিতৃবংশের মমতায় পুত্রের পা চেপে ধরতে সোমেশ্বর সেই পাপস্থলনে মাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন— 'তবে তুমি নিশ্চিত থাক, রায়-বংশের কেশাগ্র কেউ স্পর্শ করবে না।' সেই সোমেশ্বর তাঁর স্ত্রী শৈবলিনীকে একসিদ্ধ পিঠে রেখে শাল জঙ্গলে সাঁওতালদের পক্ষ নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করলেন—

> "শালজঙ্গল তখন মশালের আলোয় অদ্ভুত ভয়াল শ্রী ধারণ করিয়াছে, উপরে নৈশ অন্ধকার, আর অন্ধকারের মত গাঢ় জমাট অখণ্ড নিবিড় বনশ্রী-মধ্যস্থলে আলোকিত শালকাণ্ডের ঘন সন্নিবেশ ও মাটির উপর তাহাদের দীর্ঘ ছায়া, তাহারই মধ্যে প্রকাণ্ড অগ্নিকুণ্ড জালিয়া সিন্দুরে চিত্রিত মুখ রক্তমুখ দানবের মত হাজার সাঁওতাল। একসঙ্গে প্রায় শতাধিক মাদল বাজিতেছে-ধিতাং ধিতাং ধিতাং ধিতাং। থাকিয়া থাকিয়া হাজার সাঁওতাল একসঙ্গে উল্লাস করিয়া কূক দিয়া উঠিতেছে-উ-র-র! উ-র-র!"[৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

জমিদার সোমেশ্বর সাঁওতালদের পক্ষ নিয়ে ইংরেজিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এক হাজার সাঁওতাল নিয়ে থানা লুট, গ্রাম পোড়ানো, মিশনারীদের আশ্রয় ধ্বংস করা, ইংরেজ নর-নারীদের হত্যা করতে অগ্রসর হলে নদীর ওপারে বন্দুকধারী ইংরেজ ফৌজের গুলির আঘাতে দেহত্যাগ করেন। রামেশ্বরের সাথে রায়বংশের তেজচন্দ্রের কন্যা রাধারানীর বিবাহ হয়।

এইভাবে সেই সময় দুই পরিবারের মধ্যে সেতু রচিত হয়েছিল। আবার কিছুক্ষণ পরে রাধারানী তার পিসতুতো ভাই এর সংস্পর্শে এলে রামেশ্বর তা ভালো চোখে নেননি। সেতুতে ফাটল সেই সময় থেকে। পুত্র সন্তানের মৃত্যু, রাধারানীর গৃহত্যাগ্ রামেশ্বর পশ্চিম প্রবাসী এক শিক্ষক কন্যা সুনীতিকে বিবাহ করলেন। তাদের দুই সন্তান মহীন্দ্র ও অহীন্দ্র। মহীন্দ্র হিরু পাল নামে এক ফড়ে মহাজনকে হত্যা করলে দ্বীপান্তরিত হন। অহীন্দ্র সমস্ত জমিদারীর দেখাশোনা শুরু করেন। সেই সূত্রে সাঁওতালদের সাথে তার খুব ভাব। দাদুর মতো দেখতে বলে তাকেও সাঁওতালরা রাঙাবাবু বলেই খাতির করে। পুরাতন স্মৃতিকথা রোমন্থনে রঙলালের কথাতে অতীত গ্রামের শোভা ফুটে উঠেছে—

> “কালী নদীর একেবারে তটভূমিতে সে কি নধর কচি ঘাস গালিচার মত পুরু হইয়া থাকিত, সারা গ্রামের গরু খাইয়া শেষ করিতে পারিত না। তাহার পর ছিল তরির জমি। সে আমলে তুতপাতার চাষ ছিল একটা প্রধান চাষ। জবগাছের পাতার মত তুঁতের পাতা। চাষীরা বাড়িতে গুটিপোকা পালন করিত, —গুটিপোকার খাদ্য এই তুঁতপাতা। যে চাষী গুটিপোকা পালন করিত না, তুঁতগাছের চাষ করিত, তুঁতপাতা বিক্রয় করিয়াও সেও দশ টাকা রোজগার করিত। তখন গ্রামেরই বা শোভা কি!”[৪]

চরে এসে সাঁওতালরা বসতি স্থাপন করেছে। বন কেটে, জন্তু জানোয়ার মেরে তারা চাষ শুরু করেছে। অহীন্দ্র এখানেই দেখেছে বেনাবন থেকে আট-দশটি কালো সাঁওতাল মেয়ের সারি, কলসী নিয়ে সুর করে করে গান গাইতে তারা জল আনতে যাচ্ছে নদীতে।

> “ঘাসের জঙ্গল অতি নিপুণভাবে পরিষ্কার করিয়া ফেলিয়া তাহারই মধ্যে দশ-বারো ঘর আদিম অর্ধ উলঙ্গ কৃষ্ণবর্ণ মানুষ বসতি বাঁধিয়াছে। ঘর এখনও গড়িয়া উঠে নাই, সাময়িকভাবে চালা বাঁধিয়া, চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহার উপর মাটির প্রলেপ লাগাইয়া - তাহারই মধ্যে এখন তাহারা বাস করিতেছে। আশপাশের মাটির দেওয়াল দিয়া স্থায়ী ঘরের পত্তনও শুরু হইয়াছে। প্রত্যেক ঘরের সম্মুখে গোবর ও মাটি দিয়া নিকানো - পরিচ্ছন্ন উঠান। উঠানের পাশে পৃথক পৃথক্ আঁটিতে বাঁধা নানা প্রকার শস্যের বোঝা। বরবটির লতা, আলুগুলি ছাড়াইয়া লইয়া সেই গাছগুলি, মুসুরির ঝাড়, ছোলার ঝাড় সবই। পৃথক্ পৃথক্ ভাবে রক্ষিত; দেখিয়া অহীন্দ্র মুগ্ধ হইয়া গেল।”[৫]

এই চরে বসবাসরত আদিবাসী রমণীরা দেখতে কষ্টিপাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো, দৃঢ় তৈল মসৃণ কষ্টির মতো উজ্জ্বল কালো। পরনে মোটা খাটো কাপড়, মাথায় চুল দিয়ে বেশ পরিপাটি করে এলো খোঁপা বাঁধা, কানে খোঁপায় সদ্য ফোটা পাতা সমেত বনফুলের স্তবক। সাঁওতাল ছেলে বাঁশি বাজায় ছাগল চরানোর ফাঁকে। বনে অজগর ছাগল খেতে এলে সে বাঁশি রেখে ধনুক আর কাঁড় তীর নিয়ে সাপের মাথায় বিঁধিয়ে দেয়।

একবাটি সদ্য দোহা দুধ দিয়ে প্রৌঢ় সাঁওতাল রমণী তাদের রাঙাবাবুর আতিথেয়তা করে। রঙলাল জানায় বাস্তবে ইঁদুরে গর্ত করে, সাপে ভোগ করে। অর্থাৎ—

> “চর উঠল লদীতে, সাপখোপের ভয়ে কেউ ই-দিক আসত না। মাঝিরা এল, সাফ করছে, চাষ করছে; উ-দিকে জমিদার সাজছে লাঠি নিয়ে।-কি? না, চর আমাদের। আমরা যত সব চাষী-প্রজা বলছি, চর আমাদের। এর পর মাঝিদের তাড়িয়ে দিয়ে সবাই বসবে জেঁকে।”[৬]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মেয়েরা নেচে দেখায় তাদের রাঙাবাবুকে। সিরিৎ সিরিৎ অর্থাৎ গান, গান। মরাংবাবু রাঙাবাবুর সামনে মাদল— ধিতাং ধিতাং দুলিতে দুলিতে সাঁওতাল রমণীরা নাচতে শুরু করল। গানের বিষয় রাজার বিয়ে, রানী সাজ করে বসে আছে, রাজা তাকে লাল জবা ফুল এনে দেবে।

শুষ্ক বেনাঘাসের আঁটি বেঁধে তাতে মহুয়ার তেল দিয়ে মশাল জ্বালিয়ে বৃদ্ধ মাঝি সহ আদিবাসীরা তাদের রাঙাবাবুকে ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল।

এই চরে সাঁওতালরা বসতবাড়ি করেছে, রাস্তা করেছে, চাষ করছে, কুঁয়ো খুঁড়েছে। কুয়োর জল খুব উৎকৃষ্ট কারণ পাশের নদীর জলই ফিল্টার হয়ে আসে। সাঁওতাল জাতের প্রকৃতি রায় জমিদার ইন্দ্রনাথ জানেন, যাকে দেবতা বলে পূজা করে কখনো তারা তাকে পাথর বলবে না।

দুপুরবেলায় আদিবাসী পল্লীতে পুরুষ কেউ নাই,—

> "পল্লীর মধ্যে পুরুষেরা কেহ নাই, তারা সকলেই আপন আপন গরু মহিষ ছাগল এই বন জঙ্গলের মধ্যেই কোথাও চরাইতে লইয়া গিয়াছে। মেয়েরা আপন আপন গৃহকর্মে ব্যস্ত, তাহারা কেহই মুচকুন্দের উত্তর দিল না। দুই-একজন মাটি কোপাইয়া মাটির বড় বড় চাঙর তুলিতেছে, পরে জল দিয়া ভিজাইয়া ঘরের দেওয়াল দেওয়া হইবে। মাত্র একজন আধবয়সী সাঁওতাল এক জায়গায় বসিয়া একটি কাঠের পুতুল লইয়া কি করিতেছিল। পুতুলটার কোমর হইতে বেশ এক ফালি কাপড় ঘাঘরার মত পরানো। এই ঘাঘরার মধ্যে হাত পুরিয়া ভিতরে সে পুতুলটাকে ধরিয়া আছে।"[৭]

ইন্দ্ররায় জানেন চক-আফজলপুর চক্রবর্তীদের সম্পত্তি, তবুও স্বর্ণ প্রসারিনী ভূমি থেকে সে জমির লোভ তিনি ছাড়তে পারেননি— তিনি তাই মাঝিকে দম্ভের সাথে বলেছেন—'এ চর আমার... আমাকে কবুলতি দিতে হবে, এখানে বাস করতে হলে কবুলতি লিখে দিতে হবে।' সাঁওতালদের কাছ থেকে কবুলটি আদায়ের জন্য তিনি একটি নির্মম উপায় বের করলেন—

> "বাড়ি ফিরিয়া তিনি সাঁওতাল পল্লীতে দশজন লাঠিয়াল পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন; আদেশ দিলেন, ঠিক বেলা তিনটার সময় মাঝিদের ধরিয়া আনিয়া কাছারিতে বসাইয়া রাখিবে। সেইটাই তাহাদের খাইবার সময়। সাধারণতঃ সাঁওতালেরা অত্যন্ত নিরীহ প্রকৃতির জাতি-মাটির মত; উত্তপ্ত সহজে হয় না, কখনও কখনও ভিতর হইতে প্রলয়গ্নিশিখা বুক ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে বটে, কিন্তু সেও শতাব্দীতে একবার হয় কি না সন্দেহ।"[৮]

অহীন্দ্রের প্রতি দুর্বলতায় সে যাত্রায় ইন্দ্র রায় আদিবাসীদের নিষ্কৃতি দিয়েছিলেন। সাঁওতাল ছেলে-মেয়েরা শিকার করা খরগোশ এনে দিয়েছে, যদিও তাদের রাঙাবাবু তখন গ্রামে ছিলেন না।

মহীন্দ্রর বিচারে উকিল বলেছে—

> "প্রাচীন আমলের সামন্ততান্ত্রিক মনোভাবের জ্বলন্ত নিদর্শন'। ...এর পিতামহ সাঁওতাল-হাঙ্গামার সময় সাঁওতালদের সঙ্গে যোগ দিয়ে লড়াই ক'রে মরেছিল। সামন্তবংশের খাঁটি রক্ত ওদের শরীরে- true blood!"[৯]

এদিকে চক্রবর্তী বাড়ির গোমস্তা মজুমদার বেনামী তার শ্যালককে দিয়ে নিলাম বসিয়েছেন। মহীন্দ্রের দ্বীপান্তরে ইন্দ্র রায় মর্মাহত হলেন, স্ত্রী হেমাঙ্গিনীকে দিয়ে সুনিতিকে বলে পাঠালেন—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "সাঁওতালদের ডেকে তোমরা খাজনা আদায় করে নাও সুনীতি। আমি এইটুকু বলে গেলাম যে, তোমার দাদা আর কোন আপত্তি তুলবেন না। আর কেউ যদি তোলে, তবে তাতেও তিনি তোমাকেই সাহায্য করবেন।"[১০]

আদিবাসী লোক পুরান থেকে কমল মাঝি শুনিয়েছে ধরতিমায়ীর কথা। আগে পৃথিবীতে ছিল শুধু জল আর জল।—

> "অথ জনম কু ধরতি লেণ্ডং
> অথ জনম্ কু মানোয়া হড়
> মান মান কু মানোয়া হড়
> ধরতি কু ডাবাও আ-কাদা,
> ধরতি সানাম্ কু ডাবাও কিদা।"[১১]

লেন্ডং অর্থাৎ কেঁচো মাটি বের করে ধরতিকে বানালো, মাটিতে হল মানুষ, কেবলই মানুষ। মানুষ করলে ধরতি-মাটি খুঁড়ে চাষ, ফসল হল। এবার সারা ধরতিতে চাষ হয়ে অনেক ফসল হল। ঠাকুর সৃষ্টি করলেন হাঁস-হাসিল পাখি। আদিবাসী সৃষ্টি তত্ত্বের ইতিহাস বর্ণনায় কমল মাঝি বলেছেন ভগবান কুমীর সৃষ্টি করল মাটি তুলতে, কিন্তু সে মাটি জলে গলে গেল। বোয়াল মাছ বা ইচা হাকোও মাটি তুলতে পারল না, তৈরি করা হলো কাটকম অর্থাৎ কাঁকড়ি, সেও পারলো না—

> "তখন ঠাকুর ডাকলে লেণ্ডংকে-কেঁচোকে। শুধালে, তুমি মাটি তুলতে পারিস? উ। বললে, পারি; তা ঠাকুর, হারোকে সমেত ডাক আপুনি। হারো হল তুমার 'কচ্ছপ' গো। কচছপ এল। কেঁচো করলে কি— উয়াকে জলের উপর দাঁড় করালে, লিয়ে উয়ার পা কটা শিকল দিয়ে বেঁধে দিলে। তা বাদে, কেঁচো আপন লেজটি রাখলে উয়ার পিঠের উপর, আর মুখটি ডুবায়ে দিলে জলের ভিতর। মুখে মাটি খেলে আর লেজ দিয়ে বার করে কচ্ছপের পিঠের উপর রাখলে। তখুন আর গলে না। এমুনি করে মাটি তুলতে তুলতে পৃথিমী ভরে গেল।"[১২]

সাঁওতাল বিদ্রোহ পরবর্তী সময়ে সাঁওতালদের জীবনের করুণ কাহিনী বলতে গিয়ে কমল মাঝি বলেছেন—

> "আর উয়ারা খেপবে না বাবু। খেপলম, তারপর হাজারে হাজারে সাঁওতাল ম'ল গুলিতে। যারা বাঁচল, তারা ভাত পেলে না। সাঁয়ো ঘাস খেলে। বাবু, আমি তখন গিধরা-ছেলেমানুষ-তবু মনে লাগছে (পড়ছে), ইঁদুরের দড় (গর্ত) থেকে ধান বার করলম-গুণে চারটি ধান, জলে সিজলাম (সিদ্ধ করলাম), সেই জল খেলম, ফেন বলে। আর উয়ারা খেপবে না। তাথেই সাহস হচ্ছে না। বুলছে চেক রসিদটি না হলে উয়াদের চাষে মন লাগছে না।"[১৩]

যখন অহীন্দ্র তাদের জমি ভাগের কথা বলেছেন তারা জমি পাবে বলে খুব খুশি হয়েছে। রাজাকে তারা খাজনা দেবে, বোঙাকে পূজা দেবে। বাঁশ দিয়ে মাঝি একটি সুন্দর ছাতা বানিয়েছে, আদিবাসী পল্লী কুটির শিল্প—

> "বাঁশের বাখারি ও শলা দিয়ে তৈয়ারি কাঠামোর উপরে নিপুণ করিয়া গাঁথা শালপাতার ছাউনি; ছাউনির উপরে কোন গাছের বল্কলের সুতায় আলপনার মত কারুকার্য; অহীন্দ্র ছাতাটি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।"[১৪]

কমল মাঝির তরুণী নাতনীটি জমি পায়নি বলে রাগ করেছে,—

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "তরুণী নাতনীটি এইবার হাত নাড়িয়া অঙ্গভঙ্গি করিয়া বলিয়া উঠিল, তুরা জমি লিবি, তুদের ধান হবে, কোলাই হবে, ভুট্টা হবে, তুরা সব ঘরে ভরবি। আমরা কি করব তবে? আমাদের ঘর হবে না, বেটা-বেটি হবে না? উয়ারা কি খাবে তবে? কেনে আমরা তুদের জমিতে খাটব?"[১৫]

মোড়ল সর্দার বেশি জমি নিয়েছে, নইলে সম্মান থাকবে না যে। অহীন্দ্রের মেয়েটির গিন্নিপনা বড় ভালো লেগেছিল বলে নিজের জমি থেকে তার হবু স্বামীকে জমি দেওয়ার কথা বলেন। আনন্দে মেয়েটি নতুন শাড়ি পরেছে—

> "মেয়েটা অদ্ভুত! সাঁওতালদেরই তাঁতে বোনা মোটা দুধের মত সাদা কাপড়ে কি চমৎকারই না মানাইয়াছে! লাল কস্তায় রেলিঙের মত নকশাটা পাড়াটিও সুন্দরভাবে কাখড়খানাতে খাপ খাইয়াছে, বেণী রচনা না করিয়া সাদাসাপটা এলো খোঁপাতেই উহাদের ভাল মানায়। সরল বর্বর জাতি, স্বার্থকে গোপন করিতে জানে না, স্বার্থহানিতে পরম আপন জনের সঙ্গেও কলহ করিতে দ্বিধা করে না। কুমারী মেয়েটির স্বামী-সন্তান সম্পদের কামনা দ্বন্দ করিয়া উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিতে একটুকু কুণ্ঠা নাই। অদ্ভুত!"[১৬]

আদিবাসী পল্লী চরের বুকে সুন্দরভাবে সেজে উঠেছে। ঝকঝকে তকতকে পল্লী, পল্লীর আশেপাশে গরু, মহিষ, ছাগল চড়ে বেড়াচ্ছে। সারের গাদায় মুরগি খাবার খুটে খাচ্ছে, আঙিনার পাশে মাচার উপর কাঠশিম, লাউ, কুমড়ার লতা বেড়ে চলেছে। জাফরি বসানো বাঁধ দিয়ে সরলরেখায় বাড়িগুলিকে ঘিরে রেখেছে। ভিতরে আম কাঁঠাল, মহুয়া, সজিনা, কলমের বাঁশ গাছ। পুতুল নাচের ওস্তাদ চূড়া মাঝি ছুতারের যন্ত্রপাতি নিয়ে লাঙল তৈরি করে।

চক্রবর্তী বাড়ির দুর্দিনে সবাই ফাঁকি দিতে চায় সহায়হীন চক্রবর্তীর বাড়িকে। আদালতের পিয়ন একেবারে অন্দর দরজার মুখে এসে সমন জারি করে গেছে। অর্থাভাবে একে একে সব কর্মচারীকে জবাব দিয়ে দিতে হয়েছে। সাঁওতালরা শ্রীবাসের কাছে ধান্য-ঋণ দাদন নিয়েছে, বর্ষায় চাষের কাজ, ফলে দিনমজুরির উপার্জন নেই। শ্রীবাসের কাছে এবার ধান চাইতে গেছে, পূর্বের ধান শোধ না হওয়ায় শ্রীবাস ধান দেয়নি। খাদ্যাভাবে প্রতিদিনের বড় ইঁদুর শিকারের কথা মনে পড়ে— মারাং গাডো, মারাং গাডো। খিকড়ী! শ্রীবাস ঋণ ও সুদের জালে জড়িয়ে সাঁওতালদের জমিগুলিকে দখল করতে চায়। শ্রীবাস টিপছাপ দিতে বললে মোড়ল কমল মাঝি বেঁকে বসে—

> "কমল টিপছাপের নামে আবার চুপ করিয়া গেল। টিপসহিকে উহাদের বড় ভয়। ওই অজানা কালো কালো দাগের মধ্যে যেন নিয়তির দুর্বার শক্তি তাহারা অনুভব করে। খত শোধ করিতে না পারিলে শুধু তো এখানেই শাস্তি হইয়া শেষ হইবে না! আরও, খত কেমন করিয়া সর্বস্ব গ্রাস করে, সে তো এই বয়েসে কত বার দেখিয়াছে। কালো দাগগুলো যেন কালো ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে।"[১৭]

ধান পোঁতার আগে সাঁওতালদের বাতুলি পরব হয়। যা বিভিন্ন নামে পরিচিত, যথা—কদলেতা, রোওয়া ও বাইন। জাহর সারনে অর্থাৎ ওদের দেবতার থানে পূজা হয়, 'এডিয়াসিম' অর্থাৎ মোরগা কাটা হয়, দেবতার উদ্দেশ্যে পচুই মদ দেবে দেবতাকে, সাথে দু-তিন রকম শাক।

চরের সাঁওতল মেয়েরা ঝাঁটা, ঝুড়ি বুনে দল বেঁধে নদীর ওপারে বিক্রি করতে নিয়ে যায় দু-পয়সা রোজগারের আশায়। ঠিকাদার জিজ্ঞাসা করতেই তারা বলেছে—

> "বেঁচতে যাব। ডাওর করল, ঘরকে ধান নাই, চাল নাই, খাব কি আমরা?
> প্রত্যেকের হাতেই ঝাঁটা ও ঝুড়ির বোঝা। নানান ধরনের ঝাঁটা, ছোট বড় নানা ধরণের। ঝাঁটাগুলি বাঁধনের ছাঁদও বিচিত্র। ঝুড়িগুলিও সুন্দর এবং নানা আকারের।"[১৮]

বেনাঘাসের মূল অর্থাৎ খসখস চালান দেওয়ার জন্য সাহেব কোম্পানির সাথে চুক্তির কথা অচিন্ত্যবাবু ইন্দ্রবাবুকে জানান।

চক্রবর্তী বাড়ির জীবন পথ যখন রায়বাড়ির জীবনপথের সাথে মিলিত হয়েছে ঠিক সেইখানেই ভাঙনের অন্ধকারময় খাত অতল অন্ধ কূপের মত জেগে উঠেছে।

চিনির কল ব্যবসায়ী বিমলবাবু এলেন চর দেখতে, উদ্দেশ্য চরে চিনির কল গড়ে তুলবেন। সাঁওতালদের দেখে তিনি খুব খুশি কারণ তাদের স্বাস্থ্য ভালো, খাটতে পারে ও কাজে ফাঁকি দেয় না। তাঁর পরিকল্পনাতে রয়েছে আখের চাষ, ইটভাটা তৈরী। শহর থেকে কুলি এনে প্রথম পর্যায়ে পনেরো লাখ ইট তৈরী করবেন।

পরবের জন্য আজ প্রত্যেক ঘরে ঘরে মাড়ুলী পড়েছে আদিবাসীদের। মাটির বেদীতে গোবর ও মাটি দিয়ে নিকানো, আলপনা আঁকা হবে।

> “মেয়েগুলো তখনও সমুখের নিকানো জায়গাটির উপর খড়িমাটির গোলা দিয়ে আলপনার ছবি আঁকিতেছিল পাখী ও পশুর ছবি, তাহার পাশে পাশে খেজুরগাছের ডালপালা, ধানগাছের ছবি।”[১৯]

কমল মাঝির নাতনি সারীকে দেখে ব্যবসায়ী বিমলবাবুর খুব ভালো লাগে, তাই বলেছেন—‘মেয়েটির দেহখানি চমৎকার, tall, graceful, youth personified.’

এদিকে শ্রীবাসের মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে যায়। জমির দাম বাড়বে ফলে বন্ধকী দলিল করতে হবে, টিপছাতে তেমন কাজ হবে না। দোয়াতটা তাই টিপছাপ খাতার উপর উল্টে দেয় শ্রীবাস। শ্রীবাসের চালাকি সাঁওতালরা বুঝতে পারে না। কলকাতা থেকে টাকা ভর্তি ছালা নিয়ে ধনী মহাজন আসে। সবারই দৃষ্টি সাঁওতালদের উর্বর জমির উপর। সেজ রায় বাড়ির হরিশ রায় ফিরে আসে এই সুযোগে। রায় বাড়িতে অধঃপতিত আভিজাত্যের স্বভাব-ধর্ম অনুযায়ী কদর্য দম্ভ ও কঠিন মনোবৃত্তির পরিচয় প্রকাশ পায়। চক্রবর্তীকে সম্মতি নিয়ে রায় তরফের ইন্দ্র রায় দলিলের খসড়া মাপ করে লিখলেন, ব্যবসায়ী বিমলবাবুর চিনিকল যাতে গড়ে উঠতে পারে চরে।

চরের পরিবেশ ধীরে ধীরে পরিবর্তন হতে থাকে। ছ-মাসের মধ্যে গড়ে উঠল ইঁট ভাটা। কলকাতার কলওয়ালা মহাজন বিমলবাবু চরের ওপর বাংলো তৈরি করেছেন। চিনির কলের কাজ চলছে দ্রুত গতিতে। নদীগর্ভের জল পাম্পে করে নিয়ে তৈরি হচ্ছে ইঁট। রায়হাটের অনেকে ফলের চাকরি পেয়েছে লেবার, সুপারভাইজার হিসেবে।

> “মজুমদার এখন বিমলবাবুর ম্যানেজার, অচিন্ত্যবাবু অ্যাকাউন্ট্যান্ট, হরিশ রায় গোমস্তা। আরও কয়েকজন রায়-বংশীয় এখানে কাজ পাইয়াছে। ইন্দ্র রায়ের নায়েব মিত্তিরের ছেলেও এখানে কাজ করিতেছিল, ইন্দ্র রায় নিজেই তাহার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছিলেন, কিন্তু— সম্প্রতি বিমলবাবু দুঃখের সহিত তাহাকে নোটিশ দিয়াছেন, কাজ তাহার সন্তোষজনক হইতেছে না।”[২০]

রায়সাহেব আর কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন না, কথায় কথায় ব্যবসায়ী বিমলবাবু শুনিয়ে দেন, ‘রায়সাহেব, এটা তোমার পৈতৃক জমিদারী নয়, এটা হল ব্যবসা। এতে গলায় গামছা চলবে না।’

সারী বিমলবাবুর বাংলোয় কাজ করে। সেখানেই বাস করে। ধীরে ধীরে কমল মাঝিকে সাঁওতালরা এক ঘরে করল, সারী পঞ্চজনের কাছে ‘সামকচারী’র প্রার্থনা করল এবং জরিমানা ঘোষণার আগেই একশো টাকা পঞ্চজনকে দিয়ে দিল। একদিন দেখা গেল কমল মাঝি, তার বৃদ্ধা স্ত্রী, সারীর স্বামী রাতের অন্ধকারে গ্রাম ছেড়ে কোথায় চলে গেছে। বাংলোয় থেকে বেশভূষার প্রাচুর্যে সারীকে আর চেনা যায় না।

> “এক একদিন দেখা যায় গভীর রাত্রে সারী ভয়ত্রস্তা হরিণীর মত ছুটিয়া পালাইতেছে, তাহার পিছনে ছুটিয়াছেন বিমলবাবু, হাতে একটা হান্টার।”[২১]

ইন্দ্র রায় জমিদার হয়ে সাঁওতাল কুলিদের ওপর কর্তৃত্ব ফলাতে গেলে ব্যবসায়ী বিমলবাবু মজুমদারের মারফৎ বলেছেন—

> "একবার ইন্দ্র রায়ের কাছে আপনি যান। তাঁকে বলুন যে, আমার শরীর খারাপ বলেই আমি আসতে পারলাম না। কিন্তু তিনি যে জমিদার স্বরূপে সাঁওতালদের বেগার ধরেছেন, এতে আমার আপত্তি আছে। ওরা আমাদের দাদন - খেয়ে রেখেছে। আমার দাদন-দেওয়া কুলী বেগার ধরলে আমার কাজের ক্ষতি হয়। বুঝলেন? সে আমি সহ্য করব না। আচ্ছা, তা হলে আপনি যান ওঁর কাছে।"[২২]

বিমলবাবু এখানে মুখার্জি সাহেব নামে খ্যাত। বাবু নামটি তার পছন্দ নয়, তার বদলে মালিক, হুজুর। শ্রীবাসের থেকে সমস্ত খতগুলি কিনে নিয়ে তিনি সাঁওতালদের বললেন তোরা খেটে আমাকে শোধ দিবি, মজুরি থেকে দৈনিক এক আনা কেটে নেওয়ার ব্যবস্থা হবে। ব্যবসায়ী মুখার্জী সারী মাঝিনের ব্যাপারটি এমনভাবে খেললেন তাতে সাঁওতালরা কোনো হাঙ্গামা বাধাতে পারল না। কলের মালিকের সাফানিতে জমিদারতন্ত্র বনাম বণিকতন্ত্রের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে এমন এমন সময় জমিদার ইন্দ্ররায় গেলেন জমিদার চক্রবর্তীদের বাড়ি। মেয়ে উমার সাথে রামেশ্বর পুত্র অহীন্দ্রর বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে।

বণিকের মানদণ্ডে আদিবাসী পল্লী ছারখার হয়ে গেল, নিরীহ জাতির নারী কেড়ে নিয়ে, ভূমি কেড়ে নিঃস্ব করে দিল তাদের। অর্থের শক্তিতে, বুদ্ধির কুটিলতায় সে অজগর, রক্তহীন করে ধীরে ধীরে গ্রাস করে।

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে অহীন্দ্র-উমার বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহে নিমন্ত্রণ সত্ত্বেও সাঁওতালরা এল না। তারা এখন মুখার্জী সাহেবের প্রজা। রায় তাই রামেশ্বরকে বলেছেন—

> "সে-কাল আর নেই রামেশ্বর; এখন আমাদের আইনের পথ ধরেই চলতে হবে। আইন বাঁচিয়ে দাঙ্গা করতে পেলে পেছব না। আমাদের খাসের জমি, সেগুলো সাঁওতালদের ভাগে দেওয়া আছে, কালই সেগুলো দখল করতে হবে। সাঁওতালদেরও রীতিমত শিক্ষা দেব আমি। আর ওই যে বললাম, কালিন্দীর বুকে কলওয়ালা যে বাঁধ দিয়ে পাম্প বসিয়েছে, ওটাকে তুলে দিতে হবে। বাধবে, দাঙ্গা ওইখানেই বাধবে বলে বোধ হচ্ছে।"[২৩]

জমিদারের লোক চরের জমি দখল করতে শুরু করল। সারীকে শখ মিটিয়ে ভোগ করার পর মুখার্জু বাংলো থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে।

চর নিয়ে মামলা চলল দীর্ঘদিন। চরের উপর বয়লারের সিটি বাজছে, লাল সুরকী পথ, চিমনী, মিলহাউস নিয়ে সেটি যেন নগরের মতো ঝলমল করছে। বণিকতন্ত্র কায়েম হতে শুরু করল চরে। মোটর সংযুক্ত বিলাতি লাঙল দিয়ে জমি চষে ফেলা হল। সব মামলাতে জমিদার পক্ষ পরাজিত হল। সুনীতির ব্যথিত হৃদয় চরের মধ্যে পরিবর্তনকে প্রত্যক্ষ করেছেন—

> "আজ মনে হইল কালের ভগ্নী কালিন্দী মহাকালের নির্দেশকে প্রতিফলিত করিয়া চলিতেছে। আগে যেখানে কালিন্দীর জলে শুধু আকাশ ও নদীতীরের গাছ গাছালি তৃণবনের ছায়া ভাসিত আকাশে ওড়া বকের সারির ছবি ভাসিত-আজ সেখানে কালিন্দীর সেই স্রোতধারায় উদয় সূর্যের আলোয় আলোকিত কলের চিমনি এবং চিমনিতে ওঠা ধোঁয়ার রাশি একটা অনির্দেশ্য শাসনের মত ভাসিতেছে বলিয়া মনে হইল। আরও ভবিষ্যত কালে এই চরের ভাঙা গড়ার সঙ্গে আরও কত ছায়া আরও কত নবতর মূর্তি ওই স্রোতে ফুটিয়া উঠিবে মানুষকে ভয় দেখাইবেন কে জানে। কিন্তু তাহার আর ভয় নাই। না। বরঞ্চ চরাচরব্যাপী আলোর মধ্যে যে আশ্চর্য অভয় আছে তাহারই স্পর্শ পাইয়া সুনীতি আশ্বস্ত হইলেন। তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল।"[২৪]

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর: কালিন্দী উপন্যাস, ই বুক, বেঙ্গলি ই বুক ডট কম, ২০২২, পৃ. ২

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 30
Website: https://tirj.org.in, Page No. 255 - 264
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৫
৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৩
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬১
১৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৮
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৮১
১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৭
১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৩
১৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৯
২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩২
২১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৮
২২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৪
২৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৪
২৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০৭